পার্থসারথি

"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্ত্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকা
মুদ্রিত সংখ্যার প্রকাশ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ,২০২০
অন্তর্জাল সংখ্যার প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০২০

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-zine during prolonged Nationwide Lockdown. Website : https://www.parthasarathipatrika.com
Contact : 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. Mob: 9433284720

দশম অন্তর্জাল সংখ্যা
১০ই মাঘ, ১৪২৭ / 24.01.2021

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক
প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
তপশ্চর্যা	শ্রীমা
কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রী প্রণব ঘোষ
আচার্য মধ্বের অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
শ্রীঅরবিন্দের যোগের পন্থা	শ্রী শৈলেন রায়
সন্ধ্যা – Evening	শ্রী অরবিন্দ
বিজয় দিবস - ২০২০	শ্রী প্রকাশ অধিকারী
মেঘবাড়ী	শ্রী দীপঙ্কর নন্দী
নাবিক	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

প্রীতি-কণা

"চরিত্রই শক্তির মূল উৎস এবং উন্নতি অভ্যুদয়ের মূল কারণ জানবে। সততা ও সচ্চরিত্রতার দ্বারা মানুষের জীবনে অমোঘ বীর্য ও অক্ষয় ওজঃ সঞ্চারিত হয় – যার বলে মানুষ জয় করতে পারেনা এমন কোন কিছু জগতে নাই।"

পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

শ্রীপ্রীতিকুমারের এবারকার চিঠিগুলি নিতান্তই ব্যক্তিগত। তাঁর চরিত্রের মধ্যে যে প্রেমময় সত্তা ছিল সেটা এই চিঠিগুলির মধ্যে কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। স্বামীর লেখা চিঠি স্ত্রীর কাছে সাধারণতঃ গোপনীয় হয়ে থাকে। আমার পক্ষে আজ আর সে গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাঁর চিঠিগুলি সম্বন্ধে অনেকেই খুব আগ্রহান্বিত। যাঁরা তাঁকে ভালবাসেন তাঁরা শ্রীপ্রীতিকুমারের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও জানতে ইচ্ছুক। সেই কারণেই আমি কয়েকটি চিঠি প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। চিঠিগুলিতে বহু ব্যক্তির নাম বা ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক ঘটনা আমারও জানা নেই। সব ব্যক্তির সাথে পরিচিতিও ছিলনা। কাউকে কোন রকম দুঃখ দেওয়ার বা আঘাত করার অভিপ্রায়ে নয়, নিছকই সংগ্রাহক-সুলভ নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে আমি চিঠিগুলি হুবহু প্রকাশ করছি। একটি মহৎ কর্মময় জীবনের সাথে অনেকেই অনেকভাবে জড়িত থাকতে পারেন। আমি তাঁকে বলতাম "অবৈতনিক কল্পতরু।" কিছু চেয়ে না পেলে দুঃখ তো থাকবেই। সেরকম দুঃখ পাওয়া বহু ব্যক্তিকে আমি জানি যারা আজ আর আমাদের জীবনের সাথে জড়িত নন। তাঁদের কথা ক্রমশঃ …… ।

হাজারিবাগ,
২/৯/৫৯

প্রিয় সাথী,

যার কাছ থেকে চিঠি পেলে সব চাইতে আনন্দ ও সুখ, তার চিঠি পাচ্ছিনা। রোজ অপেক্ষা করে বসে থাকি – এই বুঝি এলো প্রিয়জনের ডাক; কিন্তু সব আশা নিরাশা। তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? রাগ তো করবার কথা নয়। তুমি স্ব-ইচ্ছায়, আনন্দের সঙ্গে বিদায় দিয়েছ। তবে কি মৌন আছো?

গতকাল ও পরশু তিলাইয়া বাঁধ ও ন্যাশানাল পার্ক দেখতে গেছিলাম। এখান থেকে ৪০ মাইল। সাথী ও সঙ্গী কেউ নেই। শুধু আমি ও ড্রাইভার। আজ কুজুতে যাব।

এবার তোমার কাছে, বাপীর কাছে ফিরে যেতে মন চাইছে। কাল সারা রাত শুধু তোমাদের কথা ভেবেছি। মাঝে মাঝে বড় উতলা হয়ে পড়ি কেন বলত?

আর ২/৪ দিন থাকতে হবে বৃহৎ কর্মের উদ্দেশ্যে। ক্ষেত্র তৈরী এখনও হয়নি। দু'চারজন বড় লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

আমি ভীষণ রাজকীয় ভাবে আছি। তুমি দেখলে খুব খুশী হতে। আমার জন্য ভাবিও। বড় একা। বাবুকে মারধর কোরনা। একটিমাত্র ছেলে। তোমার ও আমার যেমন আশা, তেমন সত্য ও প্রেমের চিহ্নও। জীবনে এমন একস্থানে আজ এসে গেছি যে বাবুকে ও তোমাকে ঘিরে সব কিছু। আশা করি কাল তোমার চিঠি পাব। ভর্তির কি হোল জানাবে।

তুমি আমার প্রাণভরা আদর নিও। বাপীকে আমার স্নেহ চুম্বন দিও।

ইতি
তোমার প্রীতিকুমার

হাজারিবাগ
11.9.59
12-30 A.M.

প্রিয় সাথী,

আজ রাত ১০টায় উড়িষ্যা থেকে ফিরেছি। ৩/৪ দিনের ভিতর ফিরব। তোমার চিঠিগুলি সব পেলাম। মেঘনাদ কাজের জন্য এলে ভালই হয়।

রেখার দুটি চিঠি পেয়েছি, টেলিগ্রামও পেলাম। লিখেছে যদি কবির সঙ্গে তার মিলন না হয় তবে সে আমার জীবন বিষময় করে দেবে এবং আমার ও তোমার মধ্যে যে প্রীতির সম্বন্ধ রয়েছে তা সে নষ্ট করে দেবে। ...

বারবার শুধু ভাবি অভিশপ্ত জীবন আর কতকাল বইতে হবে। যখনই ভেবে বসি এইবার সুখী হব, তখনই আসে মন্দের ঘটা। যাক ... তুমি ওকে কিছু লিখোনা যদি ও তোমাকে কোনও চিঠি দেয়।

বুধবারের ভিতর ফিরব। ভাবনা কোরোনা। জীবনের হাল মা ধরেছেন। তিনি যেখানে নেবার নিয়ে যাবেন। নিয়ে চলেছেন। কোনও বাধা বা ব্যথা তাকে বিচলিত করতে পারেনা।

জীবনে সকলেই আমার কাছ থেকে অফুরন্ত নিল। তার প্রতিদানে ব্যথা ও দুঃখ পেলাম। যারা পূর্ণভাবে আমাকে গ্রহণ করলো সকল দ্বন্দ্বের ঊর্ধে থেকে, তারা দিল সহায়তা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। যে ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সহায়তার জোরে ধীরে ধীরে চলেছি মায়ের কাছে।

আজকাল বাবু-অন্তঃপ্রাণ হয়েছে। কেন বলত? দূরে আছি বলে? হয়ত তাই। তুমি আজকাল অনুভূতি পাচ্ছ তার কারণ আর কিছু নয়। নিজেকে পূর্ণভাবে খুলে ধরেছ, তাই সহজভাবে ধরতে পারছ।

বাবুকে আমার স্নেহ চুম্বন দিও। তুমি আমার আদর নিও।

ইতি -
শ্রীপ্রীতিকুমার

*****

২৯/৯/৫৯

প্রিয় সাথী,

বিষ্টুর হাতে চিঠি ও পোস্টকার্ড পেলাম। যদি নিতান্তই চাকরী না করা যায় তাহলে চলে আসবে একথা বহুবার বলেছি। যতদিন কোনও সুব্যবস্থা না হয় ততদিন আমার কাছে থাকবে ছাড়া কোথায় যাবে? এসব কথা লিখে ঝালাবার কি প্রয়োজন? যখন যে অবস্থায় পড়বে এখানে চলে আসবে এটাই সহজ কথা। দাবী তোমার যেমন জন্মগত আছে, তেমন আর কার আছে? এখানে থাকায় আমার আপত্তির কারণ তোমাকে বহুবার ব্যক্ত করেছি। তুমি সেটা চোখে যেমন দেখেছ তেমন অনুভবও করেছ। হাটে-বাজারে স্ত্রী নিয়ে বাস করা যায়না। তাছাড়া বাইরের পাঁচজন অনবরত আসছে। তার মাঝে বাস

করলে সমস্ত Privacy নষ্ট হয়, আভিজাত্য নষ্ট হয়। এসব কথা তোমাকে বহুবার বলেছি। বারবার এক কথা বলা কতটুকু ঠিক তুমি জান। তোমার যখন খুশি আসতে পার, থাকতে পার। নিত্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও বোঝাপড়া করা অসংযমের পরিচয়। আমাকে কোন কথা বারবার বলতে হয় না।

বলরামপুরে কিসের চাকরী? কোথায় কোন স্কুল, কত মাহিনা জানাবে পত্রপাঠমাত্র। আমি নিজে গিয়ে সব দেখে আসব। ওখানে হলে তোমার কোন অসুবিধা হবেনা এবং আমারও যাতায়াত করবার সুবিধা হবে ... বাজারে বা দোকানে কোন দেনা রেখোনা। সব মাহিনা পেয়ে শোধ করে দেবে। অযথা কাপড় জামা কিনে কোন লাভ নেই। যখন তখন চলে আসতে হতে পারে, সেজন্য দেনা থাকা ভালো নয়।

বাপীকে আমার স্নেহচুম্বন দিও। তুমি আদর নিও।

ইতি –
প্রীতিকুমার

Lepo Road
Hazaribag
20.1.60

প্রিয় সাথী,

আগামী কাল 21.1.60 তারিখ। তোমার জীবনের একটি কৃতিত্বের ছাপ এঁকে দেবে শিক্ষা ক্ষেত্রের এক বিশেষ চিহ্ন। তুমি চিহ্নিত হবে যে পরিচয়পত্র দ্বারা, তা তোমার কর্মময় জীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করবে। তুমি যে পরিচয়পত্র পাবে তার দ্বারা সমাজের নিকট তুমি সমস্ত জ্ঞান ও কর্মের অধিকারী, তাই প্রমান দেবে। আরও উর্দ্ধতম সমাজ ও জ্ঞান লাভ করতে হলে এই পরিচয়পত্র তোমার সহায়তা করবে। আজ তুমি বিচার ও বিবেচনার অধিকারী হবে। তোমার জীবনের সাফল্যই আমার জয়ের মালা, তোমার জীবনের যা কিছু সুন্দর সে আমার জীবনে প্রেম ও আনন্দ। তোমার জীবনের অগ্রগতি আমার এগিয়ে যাবার প্রেরণা। তোমার জীবন যে জ্ঞানময় হয়ে উঠেছে, তার মূলে হোল আমি ও তুমি মায়ের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছি। জীবনভোর দেখতে চাই তোমার এই জ্ঞানলাভ করার তৃষ্ণা। জ্ঞানলাভ করবার সাধনায় যদি মানুষ লেগে থাকে তবে তাকে জাগতিক সুখ যেমন বিচলিত করতে পারেনা তেমন সে সর্বদাই তার জীবনকে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করে রাখে। তুমি মধু, তাই আমার জীবন চায় সদাসর্বদা মধুময় হয়ে থাকতে। আমার জীবন হয়ে ওঠে তুমিময়। তার কারণ আর কিছু নয়, সে যে তোমার প্রেম ও ভালবাসায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই না তার এতো আনন্দ ও উচ্ছ্বাস! আদর জেনো আর স্নেহে ভরে দাও আমাদের প্রানাধিক নন্দনকে।

ইতি
তোমার প্রেমবদ্ধ
প্রীতিকুমার

* * *

তপশ্চর্যা

শ্রীমা

অনেক সন্ন্যাসীকে লৌহ কীলকের উপর শুয়ে থাকতে দেখা যায়। কেন তারা ওরূপ করে? সম্ভবতঃ তাদের মহাপুরুষত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারা যখন প্রকাশ্য ভাবে উহা করে তখন এরূপ সন্দেহ করা যেতে পারে যে তারা লোকের কাছে নিজেদেরকে ব্যক্ত করতে চায়। তাদের মধ্যে এমন কেহ কেহ থাকতেও পারে যারা উহা আন্তরিক ভাবে এবং অকপটতার সহিতই করে; অর্থাৎ তারা উহা শুধু লোক দেখানোর জন্যই করে না। তারা কেন ওরূপ করে এ প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। তারা বলে যে তারা তাদের দেহ থেকে বিযুক্ত এই উপলব্ধি করবার জন্যই ওরূপ করে। আরও কেহ কেহ আছে যারা একটু বেশী দূর যায় এবং বলে যে আত্মাকে মুক্তি দেবার জন্য দেহকে যন্ত্রণা দেওয়া প্রয়োজন। আমি বলি যে মানুষের প্রাণ সত্তা যন্ত্রণা ভোগ করতে ভালবাসে তাই

সে দেহের উপর বেদনা আরোপ করে এক বিকৃত আনন্দ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে।

এমন সব শিশুও আছে যারা আঘাত পেয়ে আঘাতের স্থানটিকে চাপ দিতে থাকে আরও বেশী ব্যথা অনুভব করবার জন্য- বেদনা ব্যথা তাদিকে এক ধরণের সুখের অনুভূতি দেয়। বয়স্ক লোকে নৈতিকভাবে ঐরূপ করে ইহা একটি সুপরিচিত তথ্য। আমি সকল সময়েই লোকদিকে বলি- "তোমরা অসুখী হও তার কারণ তোমরা অসুখী হতে চাও। তোমরা বেদনা পাও তার কারণ তোমরা বেদনাকে ভালবাস, তা নাহলে বেদনা পেতে না।"

ঐরকম মনোবৃত্তি বড়ই অস্বাস্থ্যকর। উহা সঙ্গতি এবং সৌন্দর্যের বিপরীত। তীব্র অনুভূতি পাবার জন্য অনেকের থাকে অস্বাস্থ্যকর ব্যাকুলতা।

চীনদেশ উদ্ভাবন করেছে নৃশংস ভাবে দৈহিক যন্ত্রণা দেবার অচিন্তনীয় পন্থা। আমি যখন জাপানে ছিলাম তখন চীনাদিকে ভালবাসে এমন এক জাপানীকে ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম। সে উত্তর দিল, "সুদূর প্রাচ্যের লোকেদের, জাপানীদেরও, অনুভূতি শক্তি অত্যন্ত ভোঁতা। তাদের বোধশক্তি বড় কম। যন্ত্রণা খুব জোরালো না হলে তারা কিছুই অনুভব করে না।"

চীনাদিকে অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছে ভয়ানক উগ্র ধরণের যন্ত্রণাদায়ী যন্ত্র আবিষ্কার করতে।

যে সমস্ত লোক জড় অথবা তামসিক তাদের জড়ত্ব যত বেশী তাদের তামসিকতাও তত বেশী এবং তাদের অনুভূতি শক্তিও ততই ভোঁতা। তীব্র না হলে কোন অনুভূতিই তারা বোধ করতে পারে না, সেই জন্যই তারা হয় নিষ্ঠুর, কারণ নিষ্ঠুরতা অত্যন্ত উগ্র অনুভূতি দেয়। অপরকে যন্ত্রণা দিয়ে যে স্নায়বিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা এক অনুভূতি দেয় বৈকি! ঐরকম অনুভূতি যারা চায় তারাই নিষ্ঠুর হয়, নইলে যে তারা কিছুই অনুভব করে না। তামসিকতার বশে এক একটি জাতি সমগ্রভাবে নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে। তারা জড়, তাদের প্রাণিক সত্ত্বায় আছে জড়ত্ব। মানসিক ভাবে বা অন্য প্রকারে তারা জড় নয়। তারা প্রাণিক সত্তায় এবং দৈহিক সত্তায় জড়। বিশেষভাবে তাদের দৈহিক সত্তা অচেতন।

যাদের সৌন্দর্যবোধ আছে তারা নিষ্ঠুর হতে পারে কিনা তা একটি মনস্তাত্বিক প্রশ্ন। সৌন্দর্যবোধটি কোন স্তরের তার উপর এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে। লোকের থাকতে পারে দৈহিক সৌন্দর্যবোধ, প্রাণিক সৌন্দর্যবোধ এবং মানসিক সৌন্দর্যবোধ। কারো যদি নৈতিক সৌন্দর্যবোধ থাকে, অর্থাৎ শোভনতা এবং মহানুভবতা যদি থাকে তাহলে সে কখনই নিষ্ঠুর হতে পারে না। সে তখন হয় উদার এবং তার প্রতিটি গতিবিধি হয় সুন্দর সুসংগতিপূর্ণ। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ বহু ভিন্ন ভিন্ন অংশের সম্মিলনে গঠিত। বহু শিল্পীর সংস্পর্শে আমি এসেছি। গত শতাব্দীর শেষের দিকের এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভের যত বড় বড় শিল্পী ছিল তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাদের মাঝে আমি বাস করেছি। তাদের সত্যই গভীর সৌন্দর্যবোধ ছিল। কিন্তু নৈতিকতার দিক থেকে কেহ কেহ ছিল নিষ্ঠুর। শিল্পী তার শিল্প ঘরে সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে থাকে, কিন্তু সে ভদ্রলোকই যখন তার পরিবারবর্গের মধ্যে থাকে তখন সে অন্য ব্যক্তি হয়ে যায়। তার শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সে যুক্ত থাকে না। তখন সে হয়ে পড়ে অতি সাধারণ সামান্য ব্যক্তি। অধিকাংশ শিল্পীর অবস্থাই অনুরূপ। তবে ব্যতিক্রমও আছে। অনেকের আছে কেন্দ্রীভূত ব্যক্তিত্ব। তারা শিল্পের মধ্যেই সর্বদা বাস করে। তারা হয় স্বভাবতই উদার ও সুরুচিসম্পন্ন।

* * *

"গৃহস্থ তুমি গৃহস্থই থাক। ধর্মলাভ করিবার জন্য তোমাদের সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে গিয়া নির্জনে যোগ-ধ্যান-তপস্যা করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি যেখানে যে জীবিকা বৃত্তি, যে কর্তব্য অবলম্বন করিয়া আছো - সেখানেই থাক। ধর্মলাভের জন্য তোমাকে এক পাও অন্যত্র যাইতে হইবে না। ভারতের ঋষি, ভারতের ভগবান তোমাকে স্বধর্ম পালন করিতে বলিয়াছেন।"

– স্বামী প্রণবানন্দ

কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রী প্রণব ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মহাজীবনের শেষ আটমাস কাশীপুর উদ্যান বাটীতে অতিবাহিত করেন(১১.১২.১৮৮৫ – ১৫.৮.১৮৮৬)। এই সময়ের মধ্যে তাঁর মহাপ্রয়াণ ছাড়া সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তাঁর আত্মপ্রকাশ। ঠাকুর স্বয়ং ভগবান, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ জীবের কল্যাণের নিমিত্ত দেহ ধারণ করলেও ইতিপূর্বে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন নি। তিনি যেন এতকাল ছদ্মবেশে ছিলেন, ঐ দিনই প্রথম স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে সকলকে আশ্বস্ত করেন। ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে এবং অমোঘ আশীর্বাণীর ফলে কৃপাধন্য ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। এই জন্যে অনেকে মনে করেন ঠাকুর ঐদিন ‘কল্পতরু’ হয়েছিলেন এবং ঐ ঘটনার স্মরণে অদ্যাবধি প্রতি বছর যে উৎসব হয় তা ‘কল্পতরু’ নামেই খ্যাত।

ঠাকুর বলেছিলেন যাবার আগে তিনি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়ে যাবেন, অর্থাৎ লীলা সম্বরণের পূর্বে তিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করবেন।

প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি, যাইব যখন।।

ঠাকুর শ্রীশ্রী মাকেও বলেছিলেন যখন দেখবে কাতার দিয়ে লোক আমাকে দেখতে আসছে তখন বুঝবে আমার যাবার আর দেরী নেই (পুঁথি)। ঠাকুর যে স্বরূপ গোপন করে আছেন সে কথা তিনি স্বমুখেই ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন–‘এবারে ছদ্মবেশে’। রাজা ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ কারো কাছে ধরা পড়ে গেলে যেমন তিনি কালবিলম্ব না করে ফিরে যান তেমনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে যাবার পর তাঁর স্বধামে প্রত্যাবর্তনে আর দেরী হয় না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্বরূপ কী? তিনি সচ্চিদানন্দের নরবিগ্রহ। যিনি পূর্ব পূর্ব যুগে রাম ও কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়ে মৃয়মান ধর্মকে উদ্ভাসিত করেছিলেন সেই সচ্চিদানন্দ পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে জগতে প্রেমধর্ম প্রচার করেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কে ঠাকুর নিজের স্বরূপ প্রকাশের দিন হিসাবে বেছে নেন।

“সেই হাঁড়ি ভাঙ্গা-রঙ্গ আজিকার দিনে”।

ঠাকুরের আত্ম প্রকাশের শুভ লগ্নটি উপস্থিত হয় বিকালের দিকে। ভক্তেরা বাগানে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় তাঁরা দেখলেন ঠাকুর সেদিকেই আসছেন। তাঁর সর্ব শরীর কাপড়ে ঢাকা, মাথায় সবুজ বনাতের কান ঢাকা টুপি। মুখমণ্ডলে অপার্থিব জ্যোতি। মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত তাঁর পরমহংস দেবের জীবন বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থে লিখেছেন “মুখের যে অত শোভা হইতে পারে তাহা কাহারও জ্ঞান ছিল না। সেইরূপ আর একদিন ইতিপূর্বে নব গোপাল ঘোষের বাটিতে সংকীর্তনের সময় দেখা গিয়েছিল।”

ঠাকুরকে আসতে দেখে গৃহীভক্তদের মধ্যে অনেকেই তাঁর পিছু পিছু যেতে লাগলেন। ভক্তদের মধ্যে তখন গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রবল অনুরাগ। ঠাকুর বলতেন, ‘গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।’ গিরিশ বিশ্বাস করতেন ঠাকুর স্বয়ং ভগবান, জীবের প্রতি অসীম করুণায় দেহধারণ করেছেন। এই ধারণা তিনি প্রকাশ্যে লোকের কাছে ব্যক্ত করতে দ্বিধা করতেন না। রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ গৃহী ভক্তরা তখন বাগানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা একটি আম গাছের নীচে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। তাঁদের দেখতে পেয়ে ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন করে বলেন, “গিরিশ আমাতে তুমি কি দেখেছ যে অত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) যাকে তাকে বলে বেড়াও? ভক্তির উচ্ছ্বাসে নতজানু হয়ে গিরিশচন্দ্র করজোড়ে বললেন, “ব্যাস বাল্মীকি যাঁর কথা বলে শেষ করতে পারেন নি, দীন আমি তাঁর মাহাত্ম্য কিভাবে বলি?” এ কথায় ঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। গিরিশ তখন মহা উল্লাসে ‘জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ’ বলে বারংবার তাঁর পদধূলি গ্রহণ করতে থাকেন। কেউ কেউ ফুল সংগ্রহ করে তাঁর পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন।

এ সময়ে ভক্তবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া।
করে আনন্দের ধ্বনি শূন্য বিভেদিয়া।।
বিশেষতঃ রামচন্দ্র ভক্ত মহাবলী।
শ্রীচরণে দেন ফুল অঞ্জলি অঞ্জলি।।

ঠাকুরের তখন অর্ধবাহ্য দশা। তিনি হাস্যোজ্জ্বল মুখে সকলের দিকে চেয়ে বললেন, “তোমাদের আর কি বলি! আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য

হোক।” ভক্তদের প্রতি প্রেম ও করুণার এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করতে না করতেই ঠাকুর পুনরায় ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে ভক্তচিত্তে আনন্দের স্পন্দন শুরু হয়ে গেছে। তাঁরা ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁরা একে একে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। ঠাকুরও অর্ধবাহ্য দশায় তাঁদের স্পর্শ করতে লাগলেন। প্রত্যেকের বুক ছুঁয়ে উপরের দিকে হাত সঞ্চালিত করে তিনি বললেন ‘চৈতন্য হোক’। এই ঘটনায় ভক্তদের আনন্দের অবধি রইল না। তারা বুঝলেন ঠাকুর এতদিনে তাঁর ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন। এরপর তাঁর দেবত্বের কথা কারো কাছে গোপন থাকবে না। পাপী তাপী সকলেই সমানভাবে তাঁর অভয়পদে আশ্রয় পাবে। কৃপাধন্য ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদের ডাকাডাকি শুরু করে দেন। এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশী। পুঁথিকার লিখেছেন–

এখানে গিরিশচন্দ্র উন্মত্ত অধিক।
কে কোথা খুঁজিতে দ্রুত ছুটে চারিদিকে।।
পাকশালে গিয়া দেখে রাঁধুনী ব্রাহ্মণ।
রুটি বেলিবার তরে করে উপক্রম।।
উপাধি গাঙ্গুলী তাঁর নাম নাহি জানি।
গিরিশ আনিতে তাঁরে করে টানাটানি।।
ভাগ্যবান শ্রীগোচরে হইল আগত।
পাইল প্রভুর কৃপা আশার অতীত।।

এতক্ষণ পর্যন্ত এই আসরে শুধু গৃহীভক্তরাই ছিলেন, কোন ত্যাগী ভক্তের সমাগম হয়নি। কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্তদের ডাকাডাকিতে দু'একজন ত্যাগী ভক্ত এসে দেখেন ঠাকুরের দিব্য ভাবাবেশের অবসান হয়েছে, কিন্তু তাঁর দিব্য শক্তিপূত স্পর্শে ভক্তদের মধ্যে যে আনন্দানুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তার নিরসন হয়নি। ঠাকুরের স্পর্শে সবার মধ্যে আনন্দের শিহরণ জাগলেও ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি হয়েছিল।

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদা বলেছিলেন, “ইতিপূর্বে ইষ্টমূর্তি ধ্যান করতে বসে তাঁর শ্রীঅঙ্গের কতকটা মাত্র মানস নয়নে দেখতে পেতাম; যখন পাদপদ্ম দেখছি তখন মুখখানা দেখতে পেতাম না, আবার মুখ থেকে কোমর পর্যন্ত হয়ত দেখতে পেতাম, শ্রীচরণ দেখতে পেতাম না। এইভাবে যা দেখতাম তাও সজীব বলে বোধ হত না। আজ ঠাকুর স্পর্শ করা মাত্র সর্বাঙ্গ সুন্দর ইষ্টমূর্তি হৃদয়রূপে সহসা আবির্ভূত হয়ে একই সময়ে নড়ে চড়ে ঝলমল করে উঠল।”

ঠাকুরের কৃপা স্পর্শে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল মশাই এক সুদুর্লভ দর্শন লাভ করেছিলেন। স্পর্শমাত্র তিনি ভক্তমন্ডলী মধ্যে, বাগানের গাছের পাতায় আকাশপটে সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ দেখে এক অনির্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন। পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যেমন সব কিছুই হলুদ দেখে সান্যাল মশাই তেমনি রামকৃষ্ণময় দেখতে থাকেন।

অতুলচন্দ্র, অক্ষয় মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা সর্বদেবময়তনু শ্রীরামকৃষ্ণে নিজ নিজ ইষ্টরূপ দেখে আনন্দে বিভোর হন।

এই ঘটনাকে রামচন্দ্র প্রমুখ ভক্তরা ঠাকুরের ‘কল্পতরু’ হওয়া বলে মন্তব্য করেছেন। কল্পতরুর মতো ঠাকুর সকলকে করুণা বিতরণ করেছিলেন বলেই ঠাকুরের কল্পতরু আখ্যা। এই ব্যাপারে একটি বিষয় লক্ষনীয় ঠাকুর কোন ভক্তের জাগতিক কোন বাঞ্ছা পূরণ করেন নি। শুধু আধ্যাত্মিক আকাঙ্খাই পূর্ণ করেছিলেন।

ঠাকুরের অন্যতম ত্যাগী ভক্ত লীলা প্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ এই ঘটনাকে ঠাকুরের কল্পতরু হওয়া না বলে আত্ম প্রকাশে অভয় দান বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। এতকাল ঠাকুর নির্বিচারে কোন ভক্তকে কৃপা করেন নি অথবা নিজের দেবত্বকেও প্রকাশ করেন নি। ঐ দিনের ঘটনায় বোঝা গেল ঠাকুর নিজের দিব্য স্বরূপও গোপন রাখবেন না এবং সকল ব্যক্তিই সমানভাবে তাঁর অভয়পদে আশ্রয় লাভ করবে। তবে এও তো কল্পতরু তুল্য করুণা বিতরণ। তাই ঠাকুরের “কল্পতরু” আখ্যা অসমীচীন নয়।

* * *

আচার্য মধ্বের অলৌকিকত্ব

ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য

দেবগিরি হচ্ছে মহারাষ্ট্রের এক খণ্ডরাজ্য। ঐ রাজ্যের রাজার নাম হচ্ছে মহাদেব। তিনি বয়সে তরুণ। তাই প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে তিনি তাঁর রাজ্যের মধ্যে নানারকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রথম পরিকল্পনা হচ্ছে একটা বড় খাল কেটে দেওয়া।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজা মহাদেব খাল কাটার ব্যবস্থা করলেন। অনেক মজুর লাগান হলো। তার উপর রাজা এমন এক আদেশ করলেন যা সত্যিই অভূতপুর্ব। তিনি রাজ্যময় এক মহা আদেশ জারি করলেন। তাতে বলা হলো, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য একটা বড় খাল কাটার আয়োজন করেছি। এটি যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় ততই ভাল। এর জন্য বহু মজুর লাগানো হয়েছে। তাতে কুলোবে না। তাই স্থির করেছি, যারা পথচারী তারা খালের পাশ দিয়ে যাবার সময় অন্ততঃ একদিনের জন্য খালের মাটি কাটবে। রাজার আদেশ সকলে শুনলো।

রাজা নিজে এসে মাঝে মাঝে খাল কাটার কাজ দেখতে লাগলেন।

সেই সময় আচার্য মধ্ব তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একদল সাধুর সঙ্গে ঐ খালের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় প্রহরী তাঁকে থামিয়ে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো। সেই সঙ্গে সে রাজার আদেশের কথা শুনিয়ে বলল, আপনি কাঁধ থেকে ঝোলাঝুলি নামিয়ে রেখে অন্ততঃ একদিনের জন্য এই খাল কাটার কাজে যোগ দিন। এ হচ্ছে রাজার আদেশ। একে অমান্য করলে কঠিন সাজা পেতে হবে। আপনার সঙ্গীরাও একাজে হাত লাগাবেন।

প্রহরীর কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন আচার্য মধ্ব। তারপর বিনম্র কন্ঠে বলতে লাগলেন, ভাই, আমরা হচ্ছি সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ। আমরা চলেছি গঙ্গাতীরের তীর্থদর্শনে। রাজা যে আইন করেছেন তার জন্য তো রয়েছেন গৃহস্থ প্রজারা। তাঁরাই রাজার আদেশ মেনে চলবেন। আর আমরা হচ্ছি ভিনদেশী মানুষ। পরিব্রাজক সাধু সন্ন্যাসী। সুতরাং আমাদের উপর তো এ আদেশ বর্তাবে না।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? রাজ প্রহরীরা হাঁকডাক শুরু করে দিলো। সেই সঙ্গে উৎকট গালিগালাজও।

সেদিন দেবগিরির রাজা মহাদেব পাত্রমিত্রের সঙ্গে এসেছেন খাল খননের কাজ দেখতে। প্রহরী ও সাধুদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বচসা হচ্ছে দেখে রাজা সেখানে এলেন। গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি? কাজকর্ম না করে এখানে এতো হৈচৈ করছো কেন? প্রহরীরা তখন রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালো।

এবার আচার্য মধ্ব রাজাকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, মহারাজ, প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে আপনি এই খাল কাটার কাজে মনোযোগ দিয়েছেন এ অতি উত্তম কথা। কিন্তু এতে সাধু সন্ন্যাসীদের নিয়ে টানাটানি করছেন কেন?

উত্তরে রাজা বললেন, এ যে রাজার বিধান। এ সকলের উপর প্রযোজ্য। সেখানে সাধু-অসাধু বলে কোন ভেদ নেই।

আচার্য মধ্ব বললেন, কিন্তু কাজ করার ভার থাকে তো কেবল রাজার ও তার গৃহস্থ প্রজাদের। সাধু সন্ন্যাসীরা কেন এতে কায়িক শ্রম দিতে যাবে?

রাজা বেশ কড়া কথায় উত্তর দিলেন, কেন, সাধু-সন্ন্যাসীরা কি সমাজ থেকে কিছু পান না? তাঁদের খাওয়া পরা চলে কোথা থেকে? জনসাধারণ খাবার যোগায় বলেই তো তার প্রতিদানে তাদের কল্যাণের জন্য কিছু কিছু কাজ করা উচিত।

আচার্য মধ্ব বললেন, মহারাজ, আপনার কথা ঠিক নয়। আপনি সাধু-সন্ন্যাসীদের ভুল বুঝছেন। তাঁদের কাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্তরের। তাঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেরণা ও আশীর্বাদ নিয়ে আসে জনগণের প্রকৃত কল্যাণ।

রাজা তখন বিরক্তির সুরে বলতে লাগলেন, আমি অত তত্ত্বকথা শুনতে চাইনা। আর তা শোনারও দরকার নেই। রাজ সরকার থেকে যে আদেশ জারি করা হয়েছে তা সবাইকে মেনে চলতে হবে। আর একদিন দেরি না করে আপনারা খাল কাটার কাজে লেগে যান।

বেশ, মহারাজার আদেশ মতই কাজ হবে। তবে তার আগে আমার একটা ক্ষুদ্র নিবেদন আছে। বললেন আচার্য মধ্ব।

কি আপনার সেই নিবেদন? সতেজে প্রশ্ন করলেন রাজা মহাদেব।

আচার্য মধ্ব বলতে লাগলেন, মহারাজ, আপনি এই রাজ্যের অধীশ্বর। প্রজাদের পিতা ও রক্ষাকর্তা। তাদের মঙ্গলের জন্য আপনি এই পবিত্র অনুষ্ঠান আরম্ভ করেছেন। তাতে আপনার মঙ্গল হাতের স্পর্শ রয়েছে। এতো বড় কাজ আপনি করতে যাচ্ছেন। তাতে আপনার হাতের স্পর্শ লেগেছে কি?

না, তা লাগেনি। নরম সুরে উত্তর দিলেন রাজা মহাদেব।

এখন সেই স্পর্শ লাগান মহারাজ। আপনি আনুষ্ঠানিক ভাবে বেশ কিছুটা মাটি কাটুন। আপনার ঐ কাজ দেখে প্রজারাও কাজ করার উৎসাহ পাবে এবং আপনার কর্তব্যও পালন করা করা হবে। বললেন আচার্য মধ্ব।

রাজাও মধ্বের কথামত ঝুড়ি ও কোদাল হাতে নিয়ে খালের মধ্যে নেমে পড়লেন। রাজা অতিশয় মনোযোগের সঙ্গে মাটি কাটা আরম্ভ করলেন। তাঁর দু'চোখ লাল হয়ে উঠলো। নাক দিয়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগলো। তিনি যন্ত্রচালিত মানুষের মত প্রহরের পর প্রহর ধরে খালের মাটি কাটতে লাগলেন। কেউ তাঁকে একাজে নিবৃত্ত করতে পারছে না। কেউ কেউ মনে করলো, রাজা উন্মাদ হয়ে গেছেন। আবার কেউ ভাবলে, রাজার উপর কোন অশরীরী আত্মা ভর করেছে।

মন্ত্রী ও রাজপরিষদেরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি শুরু করে দিলো। প্রাসাদে রাণী ও পুরনারীদের কাছে রাজার ঐ অবস্থার কথা জানানো হলে তাঁরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তবে এর মধ্যে অনেকেই অনুমান করতে লাগলেন যে রাজার ঐ অবস্থার জন্য দায়ী আচার্য মধ্ব।

পরে মধ্বের জনৈক শিষ্য গুরুর অলৌকিক বিভূতির কথা প্রকাশ করলেন। তিনি মুচকি হেসে বলতে লাগলেন, রাজার দুর্ভাগ্য, আমার গুরুদেব যে কতবড় একজন মহাপুরুষ তা উনি জানেন না। মধ্ব হচ্ছেন বায়ুর অবতার। তিনি প্রভু নারায়ণের লীলার সহায়ক। তিনি রাজার উপর রাগ করেছেন। তাই বায়ু ভর করেছে রাজার উপর। এখন আমার গুরুদেবকে প্রসন্ন করতে না পারলে রাজার আর রক্ষা নেই। এভাবে দিনরাত বছরের পর বছর ধরে তাঁকে মাটি কেটে যেতে হবে।

তাই শুনে রাজার মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ আচার্য মধ্বের কাছে এসে ক্ষমা চাইল। আচার্য এবার প্রসন্ন হলেন। সেই সঙ্গে দেখা গেলো দেবগিরির রাজার ভূতাবিষ্ট ভাব কেটে গেছে। তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েছেন।

এবার স্বজনগণ সমেত রাজা মহাদেব মধ্বের শ্রীচরণে প্রণত হয়ে তাঁর কৃপা চাইতে থাকেন। মধ্ব প্রসন্ন হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বলতে লাগলেন, মহারাজ, একটা কথা সর্বদা মনে রাখবেন যে সাধুদের কর্ম সাধারণ মানুষের মত নয়। তাঁদের কর্ম ধ্যান ও মননের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। নারায়ণকে ক'জন মানুষ দেখতে পায়? নারায়ণের সেবক সাধুরাই বরং বৈকুণ্ঠের সঙ্গে সাধারণ সংসারী মানুষদের সংযোগ ঘটাচ্ছেন। সেইজন্য বলছি, সর্বদা লক্ষ্য রাখবেন যাতে সন্ন্যাসীদের কোনরকম অমর্যাদা না হয়। আশীর্বাদ করছি, আপনার এই খাল খোঁড়ার কাজ অচিরে শেষ হবে।

মধ্বের কথা শুনে মুগ্ধ হলেন রাজা। তাঁর কাছে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। তারপর বললেন। তারপর বললেন, মহারাজ, আপনি আমার রাজ্যে আরও কিছুদিন অবস্থান করুন। মধ্ব রাজী হলেন না। তিনি চলে গেলেন অন্যত্র। কিন্তু আচার্য মধ্বের কথা অচিরে ফলে গেল। চারিদিকে রটে গেলো যে রাজা মহাদেব নিজে সারাদিন ধরে ঝুড়ি কোদাল নিয়ে খাল কেটেছেন।

তাই শুনে সারা রাজ্যের সাধারণ মানুষ উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এল ঝুড়ি কোদাল হাতে। তারা প্রাণপন চেষ্টা করলো মাটি কাটতে।

মাটি কাটলোও খানিকটা। তারপর তাদের কাটার গতি এমন দ্রুততালে বেড়ে গেলো যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই খাল কাটার কাজ শেষ হোল। এভাবে রাজা মহাদেবের আশা পুর্ণ হলো।

খাল কাটার পর রাজা মহাদেবের রাজ্যের প্রজারা মহা সুখে দিন কাটাতে লাগলো। কারণ জলই হচ্ছে জীবন। সেই জীবনের সন্ধান পেলে কার না মনে আনন্দ হয়?

আচার্য মধ্বের অলৌকিক বিভূতির বুঝি শেষ নেই। পরিব্রাজকের বেশে সেবার আচার্য তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে উত্তর পশ্চিম ভারতের এক তুর্কী মুসলমান রাজ্যের সীমান্তে এসে পৌঁছেছেন। রাজ্যে প্রবেশ করতে যাবেন এমন সময় রক্ষী সৈনিকেরা তাঁদের বাধা দিল।

কিন্তু পিছু হটবার পাত্র নন আচার্য মধ্ব। সৈনিকদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কতকগুলি বিশেষ মুদ্রা দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদলটি মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো তাঁর বশীভূত হয়ে পড়লো।

এরপর মধ্ব সোজা এসে উপস্থিত হলেন তুর্কী রাজার সামনে। আচার্য মধ্ব তুর্কী ভাষা জানতেন না। অথচ তাঁর শিষ্যরা দেখল যে আচার্য মধ্ব তুর্কী ভাষাতেই রাজার সঙ্গে কথোপকথনে রত হয়েছেন।

মধ্বর সঙ্গে আলাপ করে এবং তাঁর কথাবার্তা শুনে তুর্কী রাজা এমন মুগ্ধ হলেন যে একসময় আচার্যদেবকে অনুরোধ জানালেন, আপনি শিষ্যদের সঙ্গে আমার এই রাজ্যে বেশ কিছুদিন থাকুন। আপনার সেবাযত্নের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটবে না।

কিন্তু আচার্য মধ্ব তুর্কী রাজার কথায় রাজী হলেন না। তিনি বললেন, রাজা, আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। আমাকে এবার বিদায় দিন।

তুর্কী রাজা আর কিছু বললেন না। আচার্য মধ্ব তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

* * *

শ্রীঅরবিন্দের যোগের পন্থা

শ্রী শৈলেন রায়

যোগ সাধনার উদ্দেশ্য ভগবানের দর্শন লাভ, অন্তরে বাহিরে তাঁকে পাওয়া, তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়া এবং দিব্য গুণাবলীকে আপনার জীবনে বিকশিত করা। অধিকাংশ যোগেরই পরিসমাপ্তি হয় ভগবানের সহিত মিলনে। শ্রীঅরবিন্দের যোগের লক্ষ্য দিব্য মিলনের পর দিব্য জীবন। ভগবানকে অন্তরে বাহিরে লাভ করিয়া তাঁরই জীবন যাপন করা এবং তাঁরই কর্ম সমাধা করা।

সাধারণ মানুষ অজ্ঞানতার মধ্যে যাপন করে অহমিকার জীবন। তাদের জীবন মন, প্রাণ এবং দেহের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, আত্মার বা অন্তর্নিহিত দিব্য উপস্থিতির কোন সন্ধান রাখে না। আত্মার নির্দেশবর্জিত মন-প্রাণ-দেহের জীবন পশুর জীবনেরই অনুরূপ।

যোগসাধনার দ্বারা আমাদের আত্মোপলব্ধি হয়; অন্তরের দিব্য উপস্থিতি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই এবং তখনই আমরা দিব্য কর্মী হতে সক্ষম হই। যতদিন আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকি ততদিন আমরা আমাদের সকল কর্ম ভগবানকে উৎসর্গ করতে পারি, ফলকামনা শূন্য হতে পারি, কিন্তু আমাদের কর্ম দিব্য হয় না, এবং আমাদের জীবনও দিব্য জীবন হয় না।

আমাদের আত্মা অমর এবং চিরন্তন। আমাদের আত্মায় আমরা জন্ম-মৃত্যু রহিত। এই চিরন্তন আত্মাই মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করেছে চৈত্য পুরুষ, Psychic being রূপে।

চৈত্যপুরুষই প্রকৃত মানব। দেহ-মন-প্রাণ তার যন্ত্র মাত্র। চৈত্যপুরুষই অমর আত্মা যা দেহের মৃত্যুর পর এই জীবনের অভিজ্ঞতা সঙ্গে নিয়ে আত্মলোকে গমন করে এবং যথা সময়ে আবার নূতন দেহ-মন-প্রাণ অবলম্বন করে পৃথিবীতে নেমে আসে।

এই চৈত্য পুরুষই শ্রীঅরবিন্দের যোগের মূল তথ্য। সাধারণ মানুষ কর্ম করে দেহ মন প্রাণের দাবী মেটাবার জন্য। মানব জনমের উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়। দেহ মন প্রাণের অস্তিত্বের জন্য এবং তাদের পরিপূর্ণ বর্ধনের জন্য যা প্রয়োজন তা করতেই হবে, কিন্তু এরা যন্ত্র মাত্র। চৈত্যপুরুষের দাবী মেটানোই আমাদের লক্ষ্য।

চৈত্যপুরুষের নিজস্ব কোন দাবী নাই। দিব্য জননীর দিব্য সন্তান সে। দিব্য কর্ম সমাধা করাই তার লক্ষ্য। দেহ মন প্রাণকে দিব্য কর্মের উপযুক্ত যন্ত্র করে তোলাই তার প্রয়াস।

চৈত্যপুরুষ সকল সময়েই ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বিরহ বিচ্ছেদের কোন অনুভূতি তার নাই। আমাদের মধ্যে দিব্য প্রেম, দিব্য আনন্দ, দিব্য শক্তি ও শান্তির কেন্দ্র আমাদের চৈত্যপুরুষ।

নিদারুন দুঃখবেদনার মধ্যেও আমরা নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পারি, যদি আমাদের চেতনা চৈত্যপুরুষের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং যদি আমরা

চৈত্যপুরুষের জীবন যাপন করি। চৈত্যপুরুষের জীবনে কোন নৈরাশ্য, কোন বিরোধ, কোন বিভ্রান্তি নাই।

বাইরের জীবন নিয়েই লোকে ব্যস্ত থাকে, তাই চৈত্য পুরুষের সন্ধান পায় না। বাইরের জীবনে বেদনাময় ধাক্কা খেয়ে লোকে অনেক ক্ষেত্রে নিজের প্রকৃত সত্তার, এই চৈত্যপুরুষের সংস্পর্শে এসে যায়, এবং তখনই তার আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয়। ঐ সংস্পর্শ লাভের জন্য আশ্রমবাসী হতেই হবে এমন কোন অপরিহার্য নিয়ম নাই। মন প্রাণ দেহ নিয়েই যারা তৃপ্ত থাকে তারা আত্মার সন্ধান সহজে পায় না।

চৈত্যপুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবনই প্রকৃত সাধকের জীবন এবং সাধকের জীবন যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থানেই অবলম্বন করতে পারে। জীবনের প্রতিটি কাজ চৈত্যপুরুষের সাথে যুক্ত হয়ে করতে হয়। এই পন্থাতেই হবে আমাদের সমগ্র সত্তার রূপান্তর, আমরা হব দিব্য জীবনের অধিকারী এবং স্থাপন করবো এই পৃথিবীতে দিব্য রাজ্য।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন অতিমানসিক রূপান্তর, এবং অতিমানব জাতির কথা।

চৈত্যপুরুষই নিয়ে আসবে আমাদের দেহ মন প্রাণের মধ্যে অতি মানসিক চেতনা এবং তখনই আরম্ভ হবে অতিমানসিক রূপান্তরের কাজ। রূপান্তরিত মানবীয় সত্তায় প্রকাশিত হবে অতিমানব।

কিন্তু প্রকৃত অতিমানবজাতি জন্মগ্রহণ করবে না মানবীয় পন্থায়। আমাদের চৈত্যপুরুষই অতিমানবীয় পন্থায় অতিমানব রূপে আবির্ভূত হবে এই পৃথিবীতে।

অতিমানবের জীবনই দিব্য জীবন যা পৃথিবীর অভিব্যক্তির চরম গন্তব্য স্থল।

* * *

সন্ধ্যা - Evening

শ্রী অরবিন্দ

সোনালী সন্ধ্যা এক আসে,
চিন্তামগ্ন দিনমনি যবে
যায় অস্তাচলে,
পরিহরি তার সাধারণী
ছটার গরিমা। বৃক্ষরাজি
নত হ'য়ে আভাসে গুঞ্জন তুলি
কিছু যেন বলিবারে চায় – তাদের
হরিৎ সাথীরে আর ফলবতী জননীরে।।
এইসব আর নিঃশব্দ বিস্তৃত সাগর
মিলি রচে এক কালখণ্ড ভগবৎ-সান্নিধ্যে ভরা।
যেন দীর্ঘ পথ-চলা শেষে এক জরা।
বিপুল ঐশ্বর্যে ভরা।

বিজয় দিবস – ২০২০

শ্রী প্রকাশ অধিকারী

পঞ্চাশতম বিজয় দিবস!
আজও তোমাকে আমি স্মরণ করি
অশ্রুভেজা মননে।

কত ত্যাগ, কত প্রাণের বিনিময়ে
উদিত সূর্যের আলোকে
অনেক ঝঞ্ঝা-বাত্যা
অনেক চক্রান্তের আগুন পেরিয়ে ...

আজও তোমাকে স্মরণ করি ---
অশ্রুভেজা চোখে
কাছে থেকেও দূরে বহু দূরে
আশ্রিত জীবনের আবহে ...

বঙ্গ-মাতা গো ---
ভাল থেকো তুমি,
ভাল থেকো। **

** ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ দিনটিতে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ঢাকায় ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর কাছে আত্ম-সমর্পন করেছিল।

মেঘবাড়ী

শ্রী দীপঙ্কর নন্দী

মেঘবাড়ীতে কোন জানালা নেই।
অনেক দূরের মেঘবাড়ী – অনেক দূরে
জল ঝরে – কখনো ডানাছাড়া ভেসে বেড়ায়
নীল গ্রীবা তুলে আলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
মেঘের ঠিকানায় – তখন প্রভাতী সুর
মেঘ চুপচাপ শোনে, কোন কথা বলে না-
অভিমান হলে নীরবে জল ঝরায়।

কখনো প্রচণ্ড রাগে মেঘের চোখ থেকে
ছিটকে পড়ে ক্রোধের তীব্র আলোর ঝলকানি –
শব্দব্রহ্ম দিগন্ত থেকে মহাশূন্যে ছড়িয়ে দেয়
ভীত সন্ত্রস্ত পাণ্ডুর ছবি-
মেঘবাড়িতে হুলুস্থুল আয়োজন
আলোর শব্দে অভিমানী মেঘ
সামলে ওঠে শোক, ক্রোধ, অবজ্ঞা –
ঢেউ ওঠে, ঢেউ পড়ে – মেঘবাড়ী
মুখ ফুটে কিছু বলেনা –
তারাদের সাথে নক্ষত্রের সাথে
লুকোচুরি খেলে অবোধ শিশুর মত –
আনন্দে হাততালি দেয় – খিলখিলিয়ে হাসে
মেঘবাড়ীর উঠোনে ঝলমলিয়ে ওঠে আকাশ
এক আকাশ নক্ষত্র তারাদের ভিড়ে
মেঘবাড়ী হরিণের মত চোখ তুলে তাকায় –
অভিমান ক্রোধ সব ধুয়ে-মুছে যায়,
জানালাহীন মেঘবাড়ী দূরে – অনেক দূরে
একা মিলিয়ে যায় মেঘের সীমানায়।

নাবিক

শ্রী সুনন্দন ঘোষ

চারদিক থেকে একটা একটা করে নৌকো
ভিড়ছে এপারের ঘাটে।
ছোট হয়ে আসছে পরিসর।
এবার আমার নৌকো ছাড়ার পালা।
খাঁড়ি থেকে কূল, আঘাটা থেকে বন্দর ...
ঢেউ কাটানোর খেলায় কখন পেরিয়ে গেলো ছ’-ছ’টা দশক!
বৈঠা হাতে তুলে দিয়েছিল যে মানুষেরা,
নিজের নিজের ডিঙ্গা নিয়ে তারা
একে একে পাড়ি দিয়েছে আলোর মোহনায়।
তাদের পবিত্র ওম আজও জড়িয়ে থাকে আমার শরীর।

নিবিড় কুয়াশা সামনে।
তারপর বিশ্রব্ধ পারাবার।
অজানা বন্দরের পথে নোঙর তোলার আগে
তোমাদের জন্য রেখে যাবো এক মুঠো উষ্ণতা
আর অক্ষুব্ধ অরিত্রের উত্তরাধিকার।

⁂